

[হু কিল্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব](https://www.bangabandhuonline.org/12310/)

কবি মহাদেব সাহা-র একটি কবিতার দু-চারটি লাইন দিয়ে লেখার শুরু করতে চাই । কবিতার নাম

‘আমি কি বলতে পেরেছিলাম’ । কবিতার লাইনগুলো পাঠ করলেই বোঝা যায়, কবি নিদারুণ সত্য কথাই বলেছেন । আমরা আসলেই বলতে পারিনি ।

“…তোমার রক্ত নিয়েও বাংলায় চালের দাম কমেনি

তোমার বুকে গুলি চালিয়েও কাপড় সস্তা হয়নি এখানে,

দুধের শিশু এখনো না খেয়ে মরছে কেউ থামাতে পারি না

বলতে পারিনি তাহলে রাসেলের মাথার খুলি মেশিনগানের

গুলিতে উড়ে গেল কেন?

তোমাকে কিভাবে বলবো তোমার নিষ্ঠুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

প্রথমে জয়বাংলা, তারপরে একে একে ধর্মনিরপেক্ষতা

একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলাভাষাকে হত্যা করতে উদ্যত

হলো তারা,

এমনকি একটি বাঙালী ও বাংলাভাষাকে হত্যা করতে উদ্যত

হলো তারা,

এমনকি একটি বাঙালী ফুল ও একটি বাঙালী পাখিও রক্ষা পেলো না।…”

আমরা এখন অনেক কিছুই জানতে পারছি, কিভাবে হত্যাকাণ্ডের প্লট তৈরি করা হয়েছিল। কারা বাসন্তীর জাল ছবি ছাপিয়েছিল ।

চলতি বছর (২০২০ সাল ) মার্চ মাসে প্রথমা প্রকাশন থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়েছে । বঙ্গবন্ধু সরকারে প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলামের লেখা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাছে থেকে দেখা ’ পাঠকদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে । প্রকাশিত বই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎকলন করেছি। আমার লেখার শিরোনামটি মূলত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই এর শিরোনামের সাথে মিল রেখে দেওয়া । প্রয়াত অবাঙালি সাংবাদিক এ এল খতিব (আব্দুল লতিফ খতিব ) এর বিখ্যাত বই ‘হু কিল্ড মুজিব’ অনুসন্ধানী পাঠকদের অনেক চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে ।

১৯৭৫ সালের জুন মাস নাগাদ দেশের অর্থনীতিতে মোটামুটি একটা স্থিতিশীলতার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে…মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯৩৭.৭৬ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ৮১৪.৩৩ কোটি টাকায় নেমে আসে এবং একই সময়ের ব্যবধানে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১১১.৪৯ কোটি টাকা থেকে ৩৫০.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। খাদ্য শস্যের মজুদ পরিস্থিতি অনুকূলে চলে আসায় চালের মূল্যে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। আরো কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যও নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে থাকে। জুন মাস নাগাদ চালের দাম জানুয়ারী মাসে সের প্রতি ৮ টাকা থেকে কমে ৫.৫০ টাকায়, লংক্লথ গজপ্রতি ১৩ টাকা থেকে ১১.৫০ টাকায়, সরিষার তেল সের প্রতি ৪১.৬৮ টাকা থেকে ৩০.৩৭ টাকায়, আলু সের প্রতি ২.০৫ টাকা থেকে ১.৫০ টাকায়, রুই মাছ ১৪.১৪ টাকা থেকে ১০ টাকায় এবং কেরোসিন তেল ১.৪০ টাকা থেকে ১.২০ টাকায় নেমে আসে। এতে করে জীবনযাত্রার ব্যয় ভারেও উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। ঢাকা শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক জানুয়ারী মাসের ৪৫৮.৫ থেকে এপ্রিল মাসে ৪১৬.৯ এ এবং খাদ্যমূল্য সূচক একই সময়ে ৫৪৬.৩ থেকে ৪৫৯.০-এ হ্রাস পায়। পরিস্থিতির উন্নতি চক্রান্তকারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে। তারা আর কাল বিলম্ব না করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু’র হত্যাকাণ্ডের সময় দেশের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন ফণিভূষণ মজুমদার ও খাদ্যসচিব ছিলেন ড. আব্দুল মোমেন। যে আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে তখনকার খাদ্য সচিব জড়িত ছিল। যার পুরস্কারস্বরূপ জিয়াউর রহমান তাকে খাদ্যমন্ত্রী বানিয়েছিল। আমরা সবাই জানি তিনি বিএনপি’র গুরুত্বপূর্ণ নেতা স্থায়ী কমিটির এক সদস্যের পিতা । অতএব ষড়যন্ত্র বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না।

পূর্ব বাংলায় খাদ্য ঘাটতি ১৯৫০ সালের ৫ লাখ টন থেকে বেড়ে ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রায় ১৫ লাখ টনে উন্নীত হয়। ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ বন্যা হয় তার ফলে প্রায় ১৯৭০ সালে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২২ লক্ষ টনে পৌঁছায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃষি কাজ ব্যাহত হওয়া ও বন্যায় ১৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলে খাদ্য ঘাটতি কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ১৯৭২ সালের খরায় আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনায় ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, ১৯৭৪ সালের ডবল বন্যায় (এপ্রিল মাসে সিলেটে এবং জুলাই আগস্টে সারা দেশে) প্রায় ১ কোটি টন ফসল নষ্ট হওয়ার ফলেই ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেসময় আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যসাহায্য পাওয়া যায়নি। উপরন্তু দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সেসময় খারাপ থাকায় খাদ্য পরিবহনেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া মজুদদারি ও চোরাচালান খাদ্য সংকট ভয়াবহ করে তোলে। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। জুন মাসে যেখানে প্রতি সের মোটা চাউলের মূল্য ছিল ৩.৯০ টাকা, আগস্ট মাসে তা হয় ৪.৭৮ টাকা, সেপ্টেম্বরে ৬ টাকা এবং অক্টোবর মাসে ৭.১৬ টাকায় উন্নীত হয়। সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সারাদেশে ৫,৭০০টি লঙ্গরখানা চালু করেছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও উক্ত দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসাব মতে ২৭,৫০০ জন লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। বেসরকারি হিসেব মতে তা তিনগুণেরও বেশি ছিল। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসেই পরিস্থিতি অনুকূলে চলে আসে। এমন সময় ২৭ মে ১৯৭৪-এ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মারফত এক অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ এলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানতে পেরেছে যে, বাংলাদেশ কিউবার কাছে চটের ব্যাগ বিক্রি করছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সাহায্য আইন (পিএল ৪৮০) অনুযায়ী যে দেশ কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য করছে সে দেশ ঐ খাদ্য সাহায্য পেতে পারে না। এর প্রতিক্রিয়ায় আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তা এ রকম; বাংলাদেশ জুট করপোরেশন আদাতেই ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ৪ মিলিয়ন ব্যাগ বিক্রি করেছে, এটা শুধু একবারের মতো বিক্রি। চটের ব্যাগ বিক্রির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে কিউবার কোন দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক চুক্তি নেই এবং কিউবায় চটের ব্যাগ বিক্রি বাংলাদেশের জন্য কোন নিয়মিত ব্যবসা নয়।

(তথ্যসূত্র : অধ্যাপক নুরুল ইসলামের লেখা ‘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাছে থেকে দেখা’, প্রথমা প্রকাশন , ২০২০)

কৃষকদের কল্যাণ সাধন

কৃষকের কল্যাণার্থে বঙ্গবন্ধু কতগুলো সাহসী সিদ্ধান্ত নেন।

১. সকল বকেয়া খাজনা মওকুফসহ পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন (২৬.৩.১৯৭২)।

২. পরিবার পিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করেন।

৩. প্রায় ৩০ কোটি টাকার কৃষি-ঋণ বিতরণ করেন।

৪. কৃষকদের মধ্যে দেড়লাখ গাভী বিতরণ করেন।

৫. ১৯৭৩-৭৪ সেশনে কৃষকদের জন্য ৪০ হাজার পাম্পের ব্যবস্থা করেন।

৬. সফল, নিষ্ঠাবান ও উৎসাহী কৃষকদের জন্য ‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার’ নামে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

৭. ফারাক্কা বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী বি এম আব্বাসকে দিল্লী পাঠান এবং শুকনো মৌসুমে পদ্মা নদীতে ৫৪,০০০ কিউসেক পানির নিশ্চয়তা লাভ করেন।

৮. বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুর্ণোদ্যামে চালুর ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে ৭ শতাংশেরও বেশি অর্জিত হয়েছিল। তিনি এগার হাজার কোটি টাকার ধ্বংসস্তুপের উপর আরো তের হাজার কোটি টাকার উন্নয়নস্তম্ভ দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেসরকারি হিসেব মতে তা তিনগুণেরও বেশি ছিল। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসেই পরিস্থিতি অনুকূলে চলে আসে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা কারা তৈরি করেছিল এগুলো উদ্ঘাটন ও জনসম্মুখে উন্মোচন করা দরকার । নীলফামারির জেলার ‘বাসন্তি’-র কথা সেসময় জোরেসোরে সামনে আনা হয়েছিল । যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭৪ সালে আকস্মিকভাবে বড় ধরনের বন্যা শুরু হলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। দেশজুড়ে শুরু হয় ঘরে ঘরে অভাব। আকালের মরণ ছোবলে শত শত মানুষ তখন ভুখা-নাঙ্গা। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা জুড়ে খবর বেরোয় মৃত মানুষের সচিত্র দলিল।

তখন রংপুরের জেলা প্রশাসক রুহুল আমিন মজুমদার দুর্ভিক্ষের খোঁজ-খবর নিতে আসেন। সঙ্গে আসেন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ফটো সাংবাদিক আফতাব উদ্দিন। স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আসা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ফটো সাংবাদিক আফতাব উদ্দিনকে কৌশলে ডেকে নিয়ে কুপরামর্শ দেয়। সে সময় জেলা প্রশাসক রুহুল আমীন মজুমদারকে তৎকালীন রমনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আনসার আলী দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জানান। কিন্তু জেলা প্রশাসক তখনও বুঝে উঠতে পারছে না এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে। পরে এ ফটো সাংবাদিক ইউপি চেয়ারম্যান আনসার আলীকে ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষ থেকে ডেকে নিয়ে দুজনে নাটক সাজানোর জন্য চলে যান জেলেপল্লীতে। সেখানে পরিকল্পিতভাবে তারা বাসন্তীর সমস্ত শরীরে মাছ ধরার জাল পরিয়ে ছবি তোলেন। ছবিতে দেখা যায়- লজ্জা নিবারণের মিথ্যে সান্তনা বুকে নিয়ে একটি মেয়ে কলা গাছের ভেলায় চড়ে কলাগাছের মাঞ্জা বা পাতা সংগ্রহ করছে, বন্যার পানিতে আরেকজন সাদৃশ্য নারী শ্রীমতি দুর্গতি রাণী বাঁশ হাতে ভেলার অন্য প্রান্তে বসে নিয়ন্ত্রণ করছেন ভেলাটিকে।

এই ছবি ও একটি প্রতিবেদন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দেশে-বিদেশে তোলপাড় শুরু হয়। ছবিটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ব মানবতার মন নাড়া দিয়ে ওঠে। ওই ছবিটিকে সম্বল করে জনতার সামনে তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে এতটুকুও ত্রুটি রাখেনি স্বাধীনতা বিরোধীরা। কিন্তু ৭৪-এর দুর্ভিক্ষের পর বাসন্তির আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। চিলমারীর আর একবার পরিচিতি ঘটে বাসন্তির এলাকা বলে।

বাংলাদেশের ভেতরে যারা শেখ মুজিবকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছিল, ভুট্টো তাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একাংশের নেতা আবদুল হক একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালান। কিন্তু সেই লড়াইয়ের অর্থ ও অস্ত্র আসবে কোত্থেকে? তারা ধরনা দিলেন পাকিস্তানের কাছে। ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ‘আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী’ সম্বোধন করে এক চিঠি লেখেন তিনি। চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপ

‘আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

পুতুল মুজিব চক্র এখন জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অর্থ, অস্ত্র ও ওয়ারলেস সরঞ্জাম প্রদানের আবেদন জানাচ্ছি।”

১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর আবদুল হক লিখিত চিঠিটি ভুট্টোর কাছে পৌঁছায় ১৯৭৫ সালের ১৬ জানুয়ারি। চিঠিটি পাওয়ার পর তিনি ‘অত্যন্ত জরুরি’ বলে মন্তব্য করেন এবং এই ‘সৎ লোকটি’কে (আবদুল হক) ‘কার্যকর সাহায্য’ দেওয়ার সুপারিশ করেন। আবদুল হক চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন সিলেটের মাহমুদ আলীর মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মাহমুদ আলী দখলদার পাকিস্তানিদের পক্ষ নেন এবং এর ইনাম হিসেবে ভুট্টো তাঁকে বাংলাদেশ-সংক্রান্ত (তাঁদের ভাষায় পূর্ব পাকিস্তান) বিশেষ উপদেষ্টার পদে বসান। ভুট্টোর আরেকজন এজেন্টের নাম আবদুল মালেক। বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা চালানোর উদ্দেশ্যে তিনিও সৌদি আরবে যান। সেখান থেকে ১৯৭৫ সালের ২২ জানুয়ারি ভুট্টোকে চিঠি লেখেন ‘আমার প্রিয় নেতা’ সম্বোধন করে।

মালেক লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের ৬৫ মিলিয়ন মুসলমান তাদের মুক্তির জন্য আপনার দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছে।’ (জুলফি ভুট্টো অব পাকিস্তান, স্ট্যানলি ওলপার্ট)। এই চিঠির জবাবে ভুট্টো ধর্মমন্ত্রী মাওলানা কায়সার নিয়াজীকে সৌদি আরব ও আরব আমিরাতে পাঠান। উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট দেশের কূটনৈতিক ও আর্থিক সাহায্য তথা অস্ত্রের জোগান নিশ্চিত করা। ভুট্টো ভেবেছিলেন, এঁদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন করে ইসলামি রিপাবলিক নামকরণের জন্য মুজিব সরকার কিংবা তাঁর উত্তরসূরির প্রতি (তখনই তাঁরা উত্তরসূরি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল!) চাপ সৃষ্টি করা। একইভাবে ভুট্টো চেয়েছেন পাকিস্তানি স্টাইলে বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে রাজি করাতে।

বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অর্থনীতিবিদ মুশাররফ হোসেন পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে করাচি গিয়েছিলেন থার্ড ওয়ার্ল্ড ফোরামের বৈঠকে যোগ দিতে। তার মামা ছিলেন পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের গভর্নর। তার বাসায় যে কয়জন বিশিষ্ট পাকিস্তানি নাগরিকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাদের একজন জানতে চাইলেন, বাংলাদেশ আবার পাকিস্তানের প্রদেশ হবে কিনা। জবাবে মুশাররফ হোসেন বলেছিলেন, বাংলাদেশ তো এখন একটি স্বাধীন দেশ। তখন সেই ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘ওকে তো মেরে ফেলবে কয়েক দিনে মধ্যে।’ (সূত্র: আগস্ট স্মৃতি , মাওলা ব্রাদার্স , ঢাকা ১৯৯৮)

ভুট্টো ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল কাবুলে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে তার ভাষণে বলেন, “১৯৭২ সালে আমি সিমলায় গিয়েছিলাম কারণ তখন আমাদের শান্তি দরকার ছিল। কিন্তু এখন পাকিস্তানের চেয়ে ভারতেরই বেশি শান্তি দরকার। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা এখন ভারত ও বাংলাদেশের নিজেদের স্বার্থের জন্যই দরকার।” তিনি আরও বলেন, “শিগগিরই এ অঞ্চলে কিছু বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।” ভুট্টো ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত এখানে দিয়েছিলেন ভাবলে সেটা হয়তো একটু বেশিই দূরদর্শিতা হয়ে যাবে, তবুও অনেকেই এমন দাবি করেছেন। যাই হোক তিনি শুধু মোশতাক সরকারকে খুব দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং এ সরকারকে শক্তিশালী করতে তার পক্ষে যা করা সম্ভব তার সবই করেছেন।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে ভুট্টোর ঢাকা সফরে যে ১০৭ সদস্য বিশিষ্ট দল আসে তার মধ্যে থাকা এক সাংবাদিক সফর শেষে করাচি ‘ডেইলি নিউজ’ পত্রিকায় বাংলাদেশে সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের সম্ভাবনার কথা লিখেন। তার কাছে এ সম্ভাবনাকে চমৎকার মনে হয়েছিল। কেউ ভাবতে পারেন একজন পাকিস্তানির পক্ষে হয়ত সেনা অভ্যুত্থান ছাড়া ক্ষমতার পালা বদলের অন্য কোন উপায় ভাবা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনায় যারা এক ধরনের অসুস্থ আনন্দ পেয়েছিলেন এমন অনেক পাকিস্তানিই সেটি লুকিয়ে রাখতে পারেননি। পাকিস্তানিদের মধ্যে যারা তখনও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় যৌথ বাহিনীর কাছে পাক সেনার আত্মসমর্পণের অপমান ভুলতে পারেননি তারা ভাবছিলেন এ রক্তাক্ত অভ্যূত্থানের মাধ্যমে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। কিছু কিছু পাকিস্তানি সংবাদপত্র সে-দিন শেখ মুজিবকে একজন ‘বিশ্বাসঘাতক’ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার মর্মান্তিক মৃত্যুকে বলে ‘পাপের শাস্তি’। জেড এ সুলেরী-র মত পাকিস্তানের তখনকার শীর্ষ পর্যায়ের সকলেই পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দুই টুকরা করার জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক মুজিবের মৃত্যুতে সন্তষ্ট ছিলেন। লাহোরের একটি দৈনিকে তিনি মত প্রকাশ করেন যে ‘যতোক্ষণ মুজিব জীবিত থাকবেন’ ততোক্ষণ পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না।

তার মতে, “পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির আগেই বিনাশর্তে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়াটা ছিল একটি বড় ভুল। পাঞ্জাব শেখ মুজিবের বিনাশর্তে মুক্তি মেনে নিতে পারেনি। সর্বোপরি পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা অনেক। যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান বাংলাদেশের আর্থিক কার্যক্রম ও সম্পদ বিনষ্টের উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ নেয়। এসবের ফলে বাংলাদেশের ঋণ শোধের ক্ষমতা নষ্ট হয়। বাংলাদেশের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করা হয় সেটা হিসাব করলে পাকিস্তানের ঋণের যে অংশ পরিশোধ করার দায়িত্ব বাংলাদেশের ওপর বর্তায় তার পরিমাণ হতো খুবই সামান্য। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দাতারা অবগত ছিলেন। বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজে তারাই সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তৈরি একটি মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী, পাকিস্তানের সামগ্রিক সম্পদে বাংলাদেশের অংশের পরিমাণ ৪ হাজার মিলিয়ন ডলার এবং এর সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ১ হাজার থেকে দেড় হাজার মিলিয়ন ডলারের মতো যুক্ত করা হলে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের পাওনা ৫ হাজার থেকে ৫ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলারে (১৯৭১-৭২-এর মূল্য অনুসারে)। অতএব পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে পাওনাদার ছিল। পরবর্তীকালে এক হিসাব অনুসারে যুদ্ধের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি ২১-২৩ বিলিয়ন ডলার বলে ধারণা করা হয়। এর মধ্যে অবকাঠামোগত পুঁজি দাঁড়ায় ২০ বিলিয়ন ডলার এবং মানব পুঁজি ৩ বিলিয়ন ডলার।” (তথ্যসূত্র: এস এ চৌধুরী ও এস এ বাশার, “দি এনডিওরিং সিগনিফিক্যান্স অব বাংলাদেশ’স ওয়াল অব ইনডিপেনডেন্টস: অ্যান অ্যানালাইসিস অব ইকনমিক কস্টস অ্যান্ড কন্সিকোয়েন্সস,” ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটি, কানাডা (অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি), ২০০১)

১৯৭২-৭৩ সালে শুধু খাদ্য বা ভোগ্যপণ্য নয়, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যবস্থার মেরামত ও পুনর্গঠনের জন্য এবং শিল্প কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহেও ভারত ব্যাপক সহায়তা দেয়। ভারত নিজে তেলের আমদানিকারক হয়েও বাংলাদেশের জ্বালানি তেল শোধনাগারের (রিফাইনারি) জন্য অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করে জরুরি সহায়তা করেছিল। ভারত বেসামরিক বিমান ও জাহাজ সরবরাহ করে। নতুন দেশটির জন্য সবচেয়ে জরুরি ছিল খাদ্য। ১৯৭২- এর শুরুতে বাংলাদেশ একদিকে যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষতি এবং আরেক দিকে পরপর দুবার শস্যহানীর কবলে পড়ে। ভারত সহায়তা হিসেবে শুধু ৪ লাখ টন খাদ্যশস্যই দেয়নি, খাদ্যশস্য পরিবহনেও সহায়তা করে। প্রথম ছয় মাসে মোট প্রাপ্ত খাদ্য সহায়তার ৭৪ শতাংশই ভারত দিয়েছিল। ১৯৭১-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২-এর জুনের মধ্যে ২০ কোটি মার্কিন ডলার দান হিসেবে এবং পণ্য আমদানি ও প্রকল্পের জন্য অত্যন্ত সহজ শর্তে ৪ দশমিক ২ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেয়। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সময়ে ভারত ৩০ দশমিক ৮ কোটি মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫৭.৭ কোটি মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তার পর দাতাদের মধ্যে এটাই ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সহায়তা। জিয়াউর রহমান মজ্জাগতভাবে পাকিস্তানের গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন । পাকিস্তানি সংস্কৃতির সাথে জড়িত থাকার কথা নানান সূত্রে জানা যায় । জিয়াউর রহমানের সিনিয়র মন্ত্রী ছিলেন মশিয়ুর রহমান যাদুমিয়া; তার আপন ভাই মোখলেসুর রহমান সিধুঁ মিয়ার (বিবি রাসেলের বাবা ) এক একান্ত সাক্ষাৎকার আমাদের দৃষ্টিতে আনতে পারি।

‘প্রথম আলো’র সম্পাদক মতিউর রহমান সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘প্রতিচিন্তা’-য় ২০১৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় ৬৮ পাতার এক সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল-

“জিয়াউর রহমান কিন্তু বাংলা লিখতে-পড়তে জানতেন না। তিনি শেষের দিকে যা কিছুতে সই করতেন, সেটা করতেন শুধু বাংলায় ‘জিয়া’ লিখে। আপনারা যদি তাঁর স্বাক্ষর করা ফাইল ইত্যাদি দেখেন, তাহলে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করবেন। করাচিতে তিনি লেখাপড়া শিখেছেন। যৎসামান্য বাংলা বলতে পারতেন। বাংলা লেখাপড়া কিছু জানতেন না। প্রথম দিকে তিনি বাংলায় যে বক্তৃতা দিতেন সেগুলো উর্দুতে লিখতেন। লিখে তাপরপর তা-ই দেখে দেখে ভাষণ দিতেন।”

৩.

জেনারেল জিয়াউর রহমান যে বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন তা সম্ভবত প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় ১৯৭৬ সনে বিলাতের আইটিভি চ্যানেলের ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন প্রোগ্রামে সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে দেওয়া লে.কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান এবং লে. কর্নেল (অব) খন্দকার আব্দুর রশীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। এই সাক্ষাৎকারে ফারুক-রশীদ দাবি করে যে, বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রাতের বিষয়ে ১৫ অগাস্টের বহু পূর্বেই জিয়াকে তারা অবহিত করে। ফারুক জানায়, ‘‘২০ শে মার্চ ১৯৭৫ সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটের দিকে সে জিয়ার বাসায় জিয়ার সাথে দেখা করে এবং তাকে বলে- “The country required a change”

উত্তরে জিয়া বলেন, “Yes, yes, lets go outside and talk”।

তখন জিয়া ফারুককে নিয়ে বাইরে বাড়ির লনে যায়। সেখানে ফারুক পুনরায় বলে, “We have to have a change. We, the junior officers, have already worked it out. We want your support and leadership’.

জিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। জিয়া বলেন, “If you want to do something, you junior officers should do it yourself …’’ (Anthony mascarenhas, Bangladesh-A Legacy of Blood, page 54, Hodder and Stroughton, London, 1986)|

আমরা অবশ্যই ভাবতে পারি বা প্রশ্ন করতে পারি-ফারুক-রশীদ বললো বলেই কি তা সত্য? এমনও তো হতে পারে যে, তারা তাদের দোষ কিছুটা লাঘব করার জন্য অন্যের ঘারে দোষ চাপাতে চেয়েছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে- কেন জিয়া? অন্য কোনও সিনিয়র অফিসার নয় কেন? জিয়ার নামটা কি তারা হঠাৎ করে বা র‌্যান্ডমলি বলেছে? বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৬ সনে দেওয়া জিয়ার মাসকারেনহাস-কেই দেওয়া এক সাক্ষাৎকার থেকে। মাসকারেনহাস এর ভাষায়,

“In July, 1976, While doing a TV programme in London on the killing of Sheikh Mujib I confronted Zia with what Farook had said”, (তাদের সাক্ষাৎকারে)।

জিয়া এ ব্যাপারে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ফারুকের সাথে তার এমন কথোপকথনের বিষয়টি এসেছে এভাবে-

Zia did not deny it-nor did he confirm it’’(Anthony Mascarenhas, Bangladesh- A Legacy of Blood, page 54, Hodder and Stroughton, London, 1986)|

সত্যতার আরও প্রমাণ মেলে আরও অনেক বছর পরে ১৯৯৭ সনে, যখন ফারুক জেলে আর রশীদ ইউরোপে। ১৯৯৭ সনে রশীদের সাথে মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ এর সাক্ষাৎ হয় ইউরোপে। লিফশুলজের ভাষায়,

“In 1997 I met Rashid for several hours in an European city… I went over with him exactly what he had told Mascarenhas about Zia’s involvement. Rashid confirmed to me the accuracy of his interview with Mascarenhas.”

শুধু তাই নয় রশীদ লিফশুলজকে এ ব্যাপারে আরও বহু কিছু বিস্তারিত জানায়। রশীদ জোরালোভাবে জানায়, “He (Rashid) had met General Zia numerous times prior to the coup and that Zia was fully in the picture.” (In conversation with Lawrence Lifschultz- The Daily Star, December 4, 2014)

জিয়ার সাথে ফারুক-রশীদের সাক্ষাৎ এবং আলোচনা যে আরও অনেকবার হয়েছে তার প্রমাণ মেলে রশীদের স্ত্রী জোবায়দা রশীদের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন, ‘‘একদিন রাতে ফারুক জিয়ার বাসা থেকে ফিরে আমার স্বামীকে (রশীদ) জানায় যে, সরকার পরিবর্তন হলে জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চায়। শুধু তাই নয়। জিয়া আরও বলে- “If it is a success then come to me. If it is a failure then do not involve me.’’ (আসাদুজ্জামান- বস সবকিছুর ব্যবস্থা নিচ্ছেন, প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট, ২০১৮)। একইভাবে, জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে অবহিত ছিলেন কি ছিলেন না, তা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পর কর্নেল শাফায়েত জামিল এবং জিয়ার কথোপকথন থেকে। তবে বিষয়টা বুঝতে হবে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই সকালে শাফায়েত জামিল জিয়ার সাথে দেখা করতে গেলে তাকে শেইভ করতে দেখেন। জামিল জিয়াকে বলেন, “The President has been killed, Sir. What are your orders?” জিয়া উত্তর দেন, “If the President is no longer there, then the Vice President is there. Go to your headquarters and wait there.”

তখন জামিলের দৃষ্টিতে জিয়াকে অনেক শান্ত দেখায়- Evidently aware of what had happened.” (Anthony Mascarenhas, Bangladesh-A Legacy of Blood, page 76, 1986)।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি বিষয় এখানে পরিষ্কার- বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে জিয়া পূর্বেই অবহিত ছিল; চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়নি, বরঞ্চ চক্রান্তকারীদের উৎসাহিত করেছেন এবং সেই সাথে, আসন্ন পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন।এসব তথ্য এবং বিশ্লেষণ থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এবং একটি নির্বাচিত সরকারকে অবৈধভাবে উৎখাতে জিয়ার পূর্ণ সমর্থন ছিল। এ ব্যাপারে লিফশুলজ এর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ফলাফল পরিষ্কার- “Had he (Zia) been against the coup, as Deputy Chief of the Army, Zia could have stopped it.” (তথ্যসূত্র: জিয়া কি বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত, লেখক: শামস্ রহমান , বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২১ অগাস্ট ২০১৯ )।

২০১৯ সালের ১৫ অগাস্টে ‘প্রথম আলো ’ সম্পাদক মতিউর রহমান স্বনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন লিখেছিলেন। শিরোনাম ছিল- ‘খুনি চক্রকে রক্ষা করেছে জিয়া, এরশাদ ও খালেদা সরকার’। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, ‘বিএনপি সরকার আবারও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করার পথ রুদ্ধ করে রাখে। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে আবার বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর আবার ২০০৯ সালের শুরুতে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পথ খুলে যায়। এভাবে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি জিয়া, স্বৈরাচারী এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে তিন দশকের অধিক সময় ধরেই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করতে দেওয়া হয়নি। শুধু তা-ই নয়, খুনি চক্রকে তারা রক্ষা করেছে, সহযোগিতা করেছে।”Copied.